গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা দহনে নিসর্গ প্রকৃতি যখন দগ্ধ – নিরুদ্ধ-নিশ্বাস, আর তার তৃষ্ণাদীর্ণ বুকে যখন সুতীব্র হাহাকার; তখনই একসময় মেঘ-অম্বরে আবির্ভাব ঘটে ভৈরবী হরষে ঘন গৌরবে নব যৌবনা বর্ষা রাণীর। অরণ্যসহ গ্রাম-শহর-নগর ও প্রান্তরে জাগে শিহরণের স্পর্শ। দিকে দিকে ওড়ে তার বিজয়-বৈজয়ন্তী। আকাশে দেখা যায় ধূসর পিঙ্গল কৃষ্ণঘন মেঘের সমারোহ। শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা শ্যামল শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ হোক, বর্ষার বারিধারায়...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ১
জুন ২০২২

সাধারণ সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী প্রসাদ চৌধুরী, কাজী আনারকলি, অনাবিল তসনিম, গোবিন্দ মোদক এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রে ঘেরা লেখার ক্যানভাস

নানা রঙ মিলেমিশে গড়েছে চিরন্তনের আবাস।
বুঝে, খুঁজে, গড়ে তুলতে কেটেছে বহু মাস
গুঞ্জনের পাতায় তাই আজ চতুর্থ বর্ষের উচ্ছ্বাস।

‘গুঞ্জন’ নামটির সাথে গত তিন বছর আগে পর্যন্ত হয়তো অনেকেই পরিচিত ছিলেন না, তবে ‘গুঞ্জন’-এর অস্তিত্ব বহুদিন আগে থেকেই বর্তমান। একসময় এই ‘গুঞ্জন’ ছিল কাগজের পাতায় পাতায়। তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে, আর পরিবর্তিত হয়েছে গুঞ্জনের সাজঘর। এই পত্রিকা আজ নব কলেবরে, নবীন সজ্জায় ডিজিটাল ই-পরিধির ক্ষেত্রে নিজগুণে বিশ্বের দরবারে এক শক্তপোক্ত স্থান লাভ করেছে।

যদিও প্রথম দিকে পথ চলাটা খুব সহজ ছিল না, তবুও ঠাকুরের আশীর্বাদে এবং ‘গুঞ্জন’-এর প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে লিপ্ত কর্মীগণ, কলমকারগণ ও উৎসাহী উপদেষ্টাদের সাহচর্যে ‘গুঞ্জন’ আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই চলার পথে উপদেষ্টা হিসাবে আমরা পাশে পেয়েছি কিছু স্বনামধন্য মানুষকে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন – দুই বাংলার জনপ্রিয় লেখক শ্রী পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, বাংলাদেশের প্রিয় কবি নাহার আলম, ভারতের বিশিষ্ট পরিব্রাজক ডাঃ অমিত চৌধুরী এবং প্রাণবন্ত লেখিকা ডঃ মালা মুখার্জী। ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, ওনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা

ছাড়া আমরা এত শীঘ্র এই স্থানে পৌঁছতে পারতাম না।

আমি আশা রাখি আগামী দিনগুলোতে 'গুঞ্জন' আরও সমৃদ্ধি ও সমাদর লাভ করবে। তাই সবাইকে জানাই আন্তরিক আহ্বান। এমনি করেই সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

★ ★ ★ ★

আজ এই মহানন্দের দিনে বারে বারে মনে পড়ছে সেই পুরান দিনগুলোর কথা, যাঁদের অফুরন্ত উৎসাহে ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'গুঞ্জন', তাঁদের কথা। মনে পড়ছে অগ্রজ-প্রতীম লাল্টুদা'র (৺শ্রী শ্রীকুমার ভাদুড়ি) কথা, যিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে 'গুঞ্জন'-এর স্রষ্টা এবং প্রথম রূপকার।

লাল্টুদা'র আহ্বানেই আমাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অমুদা (৺শ্রী অমিতানন্দ মৈত্র)। প্রতি সংখ্যাতে আমাদের উৎসাহ দিতে লিখতেন মাস্টার মশাই শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রিয় মিত্র শ্রী অমিত সান্যাল সমস্ত কার্য সম্পাদনের ভার না নিলে হয়তো 'গুঞ্জন' কল্পনার জগতেই থেকে যেত! আর সেদিন আমার আর অমিতের সাথে ছিল বন্ধুদ্বয় শ্রী ভোলানাথ বসু এবং শ্রী অরুণ ঘোষ।

পরবর্তী কালে স্থাপিত হাওড়া রসিক সভার স্রষ্টা ৺শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায় তখন 'শঙ্খ' (পরবর্তী কালে 'রোদ') পত্রিকার সম্পাদক, উদীয়মান লেখক হিসাবে বেশ পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। মাঝে মধ্যেই 'গুঞ্জন'-এ ওনার লেখাও প্রকাশিত হত।

পায়ে পায়ে

সেই সময়ে সাঁত্রাগাছিতে 'পান্থ' নামে একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করতেন ৺শ্রী অমল সান্যাল। 'গুঞ্জন'-এর প্রতিটি সংখ্যায় অমলদার একটি কবিতা স্থান পেত।

প্রথম দু'একবার মুদ্রণের পর, বেশ কয়েকবার 'গুঞ্জন' সাঁত্রাগাছি মোড়ের তৎকালীন স্থানীয় অঞ্চলে বিখ্যাত প্রেস 'জয় প্রিন্টার্স' থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। জয় প্রিন্টার্স-এর মালিক টুনুদার (৺শ্রী নির্মল দাস) তত্ত্বাবধানে খুব যত্ন সহকারে 'গুঞ্জন'-এর প্রিন্টিং হত। অমায়িক প্রকৃতির টুনুদার কাছে আমরা প্রিন্টিং সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছিলাম। তা ছাড়া ঐ প্রেসে জগাছার গভর্নমেন্ট প্রেসের কিছু স্টাফ পার্ট টাইম কাজ করায়, 'গুঞ্জন'-এর প্রিন্টিং-টা তখন খুব সুন্দর হত। ঐ সময়েই একবার হাওড়া প্রেস ক্লাবের 'লিটল ম্যাগাজিন শো'-তে 'গুঞ্জন' খুব প্রশংসিত হয়েছিল।

শেষ মুদ্রিত সংখ্যাটি অবশ্য ন্যাশনাল প্লেস, বাকসাড়া থেকে ফুটুনদার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ফুটুনদা আমাকে কম্পোজ করার এবং প্রিন্টিং মেশিন চালানোর পদ্ধতিগুলিও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তবে জীবনে তা নিয়ে আর আগে এগোনোর সুযোগ বা প্রয়োজন কোনটাই হয়নি।

প্রায় চার দশক পরে লাল্টুদার স্বপ্নকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরে আজ আমি সত্যিই আনন্দে আপ্লুত। আর রাজশ্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পিনাকীবাবুরর অফুরন্ত সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ কখনই সম্ভব হত না।

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

শিব দুহিতা নর্মদা

ষষ্ঠ পর্যায় (৪)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

আজ ২৫শে এপ্রিল মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় যথারীতি বেড়িয়ে পড়েছি। এবারের রাস্তা নদীর পাড় নয় চাষের জমি। প্রায় তিন কিলোমিটার হেঁটে একটি গ্রাম পাওয়া গেল — নাম কুণ্ডতলা। এক বৃদ্ধ চা-খাওয়ার অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করার কোনো কারণই নেই। রাস্তা তৈরী হচ্ছে, প্রচণ্ড ধুলো। হাঁটার গতি কমে যাচ্ছে। সূর্যের তাপ স্ব-মহিমায় বিরাজিত। এখন আর কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয় না। মন সে ভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। কখনো জনপথ, কখনো চাষের জমিকে পিছনে ফেলে 'নর্মদে হর' বলতে বলতে এগিয়ে চলেছি।

আমাদেরও এই চলার বহু আগে যুগ যুগ ধরে কত পরিক্রমাবাসী সাধু এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছেন। তাঁদের পবিত্র পদধূলির স্পর্শে আমরা নিজেদের ধন্য করার সুযোগ পাচ্ছি। একি কম? সুদূর কলকাতা থেকে আমার মতো এক তপবলহীন মানুষ ঋষি মার্কণ্ডেয়র দেখানো পথ ধরে মা নর্মদার এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে, এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে পৌঁছে যাচ্ছি। এটা ভাবতেই রোমাঞ্চিত

হচ্ছি। গুরু এবং মা নর্মদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল। আমি খেয়াল করিনি। একটি আমগাছের তলায় ওনারা বাকি তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। কাকাজী বললেন, "ডাঃ বাবু আমরা গোদাগাঁও এসে গেছি। দুপুরে এখানেই বিশ্রাম নেব। এখানে নর্মদার সাথে গঞ্জাল এবং গোমতী নদীর সঙ্গম হয়েছে।"

সকাল থেকে প্রায় আঠেরো কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেল। এখানেই আছেন গঞ্জালেশ্বর মহাদেব। এক কিলোমিটার দূরে সৃষ্টি হয়েছে তিনটি নদীর ত্রিবেণী সঙ্গম। গঞ্জাল, নর্মদা এবং গোমতী। স্কন্ধপুরাণ অনুযায়ী, এই গোদাগাঁও থেকেই শুরু হচ্ছে ওঙ্কারেশ্বর ঝাড়ি। আমরা গঞ্জালেশ্বর মন্দিরে দুপুরে আসন পাতলাম। বিকাল চারটে। এক কিলোমিটার দূরে ভগবান দত্তাত্রেয়র সাধনস্থল। গঞ্জেশ্বরী মঠ।

তরুণ সন্ন্যাসী আশিষ ভারতী আমাদের পুরো আশ্রম ঘুরিয়ে দেখালেন। জাপানী স্থাপত্য কলায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন রাজা প্রায় পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে এই মন্দির আশ্রমটি তৈরী করে তখনকার আশ্রমের মোহন্তের হাতে সমর্পন করেন। প্রচুর জমি এবং ধর্মশালা মন্দির এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। দেখার লোক নেই কিন্তু দখল নেওয়ার লোক প্রচুর। তিনটি নদীর মতো তিনটি জেলারও সঙ্গম এই জায়গাটি। হোসেঙ্গাবাদ, হারদা এবং সিওর। এখানে ত্রিনাথ মন্দিরটিও দেখার মতো। অমাবস্যা লেগে যাওয়ার জন্য দূরে একটি গ্রাম থেকে কালী পূজোর

মন্ত্র শোনা যাচ্ছে। বেশি দূর না গিয়ে এই পবিত্র আশ্রমেই আজ আসন পাতলাম।

আজ বুধবার ২৬শে এপ্রিল। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে 'নর্মদে হর' বলে বেড়িয়ে পড়েছি। রাস্তা খুবই খারাপ তবুও যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা মাত্র। প্রায় আটটার সময় এলাম ছোটি ছিপনা গ্রামে। আমাদের অপেক্ষা করার ইচ্ছা নেই। কিন্তু লম্বা চুল এবং গোঁফের অধিকারী লম্বা একটি লোক ছুটে এসে আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। আমি বুঝলাম লোকটি দিব্যানন্দজীর চেনা। তিনি তাঁর চায়ের দোকানে বসিয়ে আমাদের চা খাওয়ালেন। গত পনেরো বছর ধরে এই লোকটি বিভিন্ন ভাবে পরিক্রমাবাসীদের সেবা করে চলেছেন। ধন্য এই তপভূমি ভারতবর্ষ। প্রতিটি ধুলিকণাতে লেগে আছে ত্যাগের মহিমা। আবার চলা শুরু। আমরা পেড়িয়ে এলাম চিচোড়, জলোদা। রাস্তার পাশে একটি বাড়ি থেকে আমাদের দুপুরের ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

দুপুর সাড়ে বারোটা। দিব্যানন্দজী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওদের ধন্য হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। তাছাড়া দিব্যানন্দজীর পায়ে চোট লেগেছে। ওনারও একটু বিশ্রামের দরকার। সকাল থেকে প্রায় উনিশ কিলোমিটার পথ হাঁটা হয়ে গেল।

বিকাল চারটেতে যথারীতি বেড়িয়ে পড়েছ। দিব্যানন্দজীর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ওনার ইচ্ছা কাছাকাছি কোনো গ্রামে

নমামি দেবী নর্মদে

আজকের মতো রাত্রিবাস। ঘণ্টাখানেক চলার পর একটি আশ্রম পেলাম। তপবনের মতো সুন্দর। পাশে নর্মদা বয়ে চলেছে। শিব মন্দিরও আছে। পরিক্রমাবাসীদের থাকার জায়গাটিও ভারী সুন্দর। বিভিন্ন রকম প্রচুর ফলের গাছ আছে। আমরা রাতে এখানেই থাকবো ঠিক করলাম। যদিও আজকে খুব অল্পই হাঁটা হল, তবুও কোনো অসুবিধা নেই। দিব্যানন্দজীর বিশ্রামের খুব দরকার।

"নর্মদে হর"

...ক্রমশ ■

হারিয়ে যাওয়া লোকসাহিত্যের ইতিকথা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

সময় আর নদীর স্রোত উভয়ই বহমান। আর এই সময়ের স্রোতে আর পাঁচটা জিনিসের মতো সাহিত্যের ভাব, লেখনি কৌশল, আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে যেমন নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে, ঠিক তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার আনন্দনীয় ও শিক্ষণীয় উপকরণ সমূহ। গ্রাম বাংলার লোক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত বিভিন্ন সাহিত্যের উপাদানগুলি আজও বাঙালীর হৃদয় গহীনে সুপ্ত সম্পদের মতো মর্মে মর্মে গ্রথিত হয়ে আছে। তবে যে লোক সাহিত্যের কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়, তা মৌখিক সাহিত্য বলা যেতে পারে।

লোকসাহিত্যের কথা এলেই প্রথমে যে প্রশ্ন সবার আগে মাথায় আসে, সেটা হল — লোকসাহিত্য কি? গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কিংবা সুখ দুঃখের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকে নিয়ে সংগঠিত হয় লোক সাহিত্যের প্রেক্ষাপট। লোকের মুখে মুখে এই সাহিত্যের

উৎস

জন্ম, আর মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে এর বিস্তার। কিন্তু যান্ত্রিক শহুরে জীবনের ডামাডোলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি প্রাণবন্ত জীবনের স্বাদ। এই জীবনের স্বাদ খুঁজে নিতে পৌঁছাতে হবে গ্রাম বাংলার সাহিত্যের আঁতুড়ঘরে।

হারিয়ে যাওয়া লোকসাহিত্যের খোঁজ করলে আজও গ্রামীণ সংস্কৃতির আনাচে-কানাচে খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন লোক সাহিত্যের ধারা। আর লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার কথা এলেই, প্রথমেই মনে পড়ে ছড়া-গানের ইতিকথার। ছড়ার মধ্যে ছেলে ভোলানো গান, ঘুম পাড়ানি গান, মেয়েলি ছড়া, ব্রত ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া প্রভৃতি মধুর ছড়ার ছন্দ অনবদ্য। তবে শুধু ছড়া নয়, ধাঁধা, প্রবাদের ভিতরও রয়েছে গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা। যেগুলি ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

লোকসাহিত্যে প্রধানতম সুর ও ছন্দের মিল ঘটেছে গানে। গানের কথা উঠলেই সর্ব প্রথমেই একতারার সুরের বাউল গানের সুর হৃদয়কে আলোড়িত করে। মানবিক কামনা নিয়ন্ত্রিত করা ও পরমাত্মার সাথে মিলন ভাবনায় এই গানের মূলভাব। এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায় মুর্শিদি গানেও।

নারী হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ হয় ভাদ্রমাসে আয়োজিত ভাদুগান ও পৌষ মাসে আয়োজিত টুসুগানের

পরবের মাধ্যমে। এছাড়া আখ্যানমূলক পটুয়া সঙ্গীত, ঝুমুর গান, নাচনী, হাপু গানে মনোমুগ্ধকর সুর ঝংকার মনকে বাংলা সংস্কৃতির সাথে নব ভাবে পরিচিত করায়।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে লোকসাহিত্য রামধনুর মতো বিস্তৃত। এক বিশ্ব সাহিত্যের গগন মণ্ডলে এই রামধনু ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে গান রচনা ও পরিবেশনা করাই শেষ কথা নয়। কর্ম্মমুখর মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে সংস্কৃতির রূপ-রস-মাধুর্য। নদী, নৌকাবাহীদের সুরে ভেসে আসে বাইচদের প্রেম ভাবনামূলক সারিগান। মাঝি মল্লারদের ভাটিয়ালি গানে উদাস প্রেমের সুর মনকে মুগ্ধ করে চিরদিন।

ছড়া, গানের কথা এলেই আসে নাটকের আস্বাদ গ্রহণের কথা। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙিয়ে বসে আসর। প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করে সঙ্গীত সহকারে আয়োজিত হয় গম্ভীরার পালা। লোকনাট্য বাংলা নাট্য সাহিত্য ভাবনার ক্ষুদ্র সংস্করণ।

গল্প শুনতে ছোটো থেকে বড় সবাই খুব ভালবাসে। গল্প কথা তথা লোককথা বলতেই ঐতিহ্যপূর্ণ রূপকথার জগতে মন বিচরণ করে। বাংলা সাহিত্যে এই রূপকথাকে আশ্রয় করে বহু মূল্যবান রূপকথার গল্প রচনা হয়েছে, যা একই ভাবে চিরন্তনের জন্য অমরত্ব লাভ করেছে। রূপকথার মতো পরী কথাও শিশুমনকে সহজ-সরল সারল্যের কল্পনার

আমোদে আহ্লাদিত করে। লোককথা যে শুধু মানুষ ও পারিপার্শ্বিক কিংবা কল্পনার জগৎ নিয়ে রচিত হয়, তা কিন্তু নয়। পশুপাখিরাও গল্পের মূল চরিত্র হয়। এই পশুপাখি-কেন্দ্রিক গল্পগুলি পশুকথা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই পশুকথা গল্পের আড়ালে থাকে জীবন সম্পর্কে নীতিকথা। আবার ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে লৌকিক কথা সাহিত্যের রূপধারণকারী লোককাহিনীকে নিয়ে তৈরি হয় কিংবদন্তি কাহিনী। এছাড়া আছে লোকপুরাণ বা মিথ। তবে লোককথার গল্প শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও এই রীতির ছোঁয়া আছে। তবে বাংলা লোককথার এক অনবদ্য উপাদান ব্রতকথা, যা শুধুমাত্র গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এই ব্রতকথার আড়ালে থাকে ব্রত উৎযাপনের নানান কাহিনী।

এইভাবে যুগ যুগ ধরে লোকসাহিত্যের বিচিত্র বিষয়বস্তু মানুষকে আনন্দ প্রদান করে চলেছে। এই লোকসাহিত্য মৌখিক হলেও সাহিত্যে এই ধারার বিচরণ চিরন্তন। সময় ও সাহিত্য সব কিছুই এগিয়ে চলেছে নতুন নতুন ভাবনাকে কেন্দ্র করে, তবে কিছু জিনিস প্রাচীন হলেও নিজগুণে চির প্রভাবশীল। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় লোকসাহিত্য হল বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দর্পণ। ■

জ্বালানী কোষের ব্যাপক প্রয়োগ

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

বেশ কিছু সময় ধরেই, বিশ্বব্যাপী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির (renewable energy) বিকাশকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, এবং প্রাথমিকভাবে সৌর এবং বায়ু শক্তির বিস্তারই সর্বত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে এর মধ্যেই জ্বালানী কোষ বা ফুয়েল সেল-গুলিও (fuel cells) তাদের নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে। জ্বালানী কোষগুলি (fuel cells) পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির (renewable energy) প্রথাগত সংজ্ঞার (traditional definition) মধ্যে ঠিক পড়ছে কিনা - এটি এখনও বিতর্কিত। তবে, স্বতন্ত্র শক্তির উৎস হিসাবে (as sources of standalone power) এই যন্ত্রগুলির বিস্তৃত সম্ভাবনা রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এরা ইতিমধ্যেই সৌর ও বায়ু প্রকল্পের (project) পরিপূরক শক্তির উৎস হিসাবে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়েছে।

যদিও জ্বালানী কোষ (fuel cell) কি বা কত রকমের হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করা এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়, তবুও খুব সংক্ষেপে এখানে জ্বালানী কোষ-এর সম্পর্ক দু'একটা কথা বলে রাখি।

ইকেপিও ফুয়েল সেল টেকনোলজিস কোম্পানির বানানো একটি অত্যাধুনিক জ্বালানী কোষ (fuel cell)...

© EKPO Fuel Cell Technologies

একটি জ্বালানী কোষ পরিষ্কারভাবে এবং দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হাইড্রোজেন বা অন্যান্য জ্বালানির রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে। যদি হাইড্রোজেন জ্বালানী হয়, তবে এর উৎপন্ন পণ্য (outcome) হল বিদ্যুৎ, জল এবং তাপ। জ্বালানী কোষ তাদের সম্ভাব্য প্রয়োগ (application) বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অনন্য; এরা বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী এবং ফিডস্টক (feedstock) ব্যবহার করতে পারে এবং একটি ইউটিলিটি পাওয়ার স্টেশনের (utility power station) মতো বড় এবং একটি ল্যাপটপ কম্পিউটারের (laptop computer) মতো ছোট সিস্টেমগুলির (systems) জন্য শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

আমাদের সরকার, শিল্প সংস্থা এবং বিজ্ঞানীরা জ্বালানী কোষগুলিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটির গবেষকরা একটি বায়ো-ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ডিভাইস, মাইক্রোবিয়াল ফুয়েল সেল (Microbial Fuel Cell - MFC) তৈরি করেছেন যা বর্জ্য জল শোধন করে সবুজ শক্তি (green energy) তৈরি করতে পারে।

আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্বালানী কোষকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে ভারতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এ বছর মার্চ মাসে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নিতিন গড়করি নতুন দিল্লিতে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির গ্রীন হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইলেকট্রিক ভেহিকেল (Green Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) 'টয়োটা মিরাই'-এর উদ্বোধন করেছেন। এছাড়াও, ফেব্রুয়ারিতে, ব্যালার্ড পাওয়ার সিস্টেমস ভারতে জ্বালানী কোষের বাণিজ্যিকীকরণের জন্য একটি যৌথ বিনিয়োগের প্রয়াস মূল্যায়ন করার জন্য আদানি গ্রুপের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সম্প্রতি কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড, জ্বালানী কোষ চালিত জাহাজ নির্মাণের উপাদান (components) বানানোর জন্য নতুন কোম্পানিগুলিকে (start-up companies) প্রথম দফায় ৫০ কোটি টাকার সহায়তা দেবার আশ্বাস দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে কয়েক বছরের মধ্যেই, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জ্বালানী কোষের ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হবে। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ মা দুর্গা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

রুমাল

(দ্বিতীয় পর্ব)

অনাবিল তসনিম (বাংলাদেশ)

আনিসকে দেখেই রমিজ খান (প্রধান শিক্ষক, মোহনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়) কঠিন গলায় বললেন, ইয়াকুব, "তুই এই পাগলকে কোত্থেকে ধরে আনলি?" হতভম্ব আনিস বলল, "আমি পাগল?"

"অবশ্যই পাগল। তুই যদি এখন এখান থেকে না যাস, তাহলে গ্রামের লোকজন দিয়ে তোকে বের করে দেবো। নিজের ভালো চাইলে দ্রুত কেটে পড়।"

ইয়াকুব আলী বললেন, "স্যার, আপনি এসব কি বলছেন? আপনি কি ওনাকে চেনেন?"

"অবশ্যই চিনি। চিনবো না কেন? এই পাগল তো গতকালও স্কুলে এসেছিল।"

আনিসের মনে পড়লো, সে গতকাল এখানে এসেছিল। ইদানীং তার এই সমস্যা হচ্ছে। কোনো কথাই মনে থাকছে না। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাই তার এখন মনে থাকে না। কেন এরকম হচ্ছে কে জানে?

আনিস বলল, "স্যার, আমার নাম আনিস। আমি ঢাকা

ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স শেষ করেছি। আগামী বছর রবার্ট ফ্রস্টের ওপর পিএইচডি করবো ইনশাআল্লাহ...”

আনিস কথা শেষ করতে পারলো না। কথা শেষ করার আগেই রমিজ খান বললেন, “তুই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তুই আজকে আমার স্কুলে ক্লাস নিবি। ক্লাস ঠিকঠাক নিতে পারলে বিশ্বাস করবো যে তোর কথা সত্যি।”

আনিসকে ক্লাস নিতে পাঠানো হল। তার ক্লাস করে ছাত্রছাত্রীরা সবাই মুগ্ধ। রমিজ খান তাঁর ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলেন। তিনি আনিসকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। রমিজ খান যে তাঁর ব্যবহারের জন্য শুধু লজ্জিত তা-ই নয়, সম্ভবত তিনি অনুতপ্তও।

তিনি যে অনুতপ্ত, এটা তাঁর ‘অতিথি আপ্যায়ন’ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আনিসের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার টেবিল নানারকম সুস্বাদু খাবারে সজ্জিত। সবগুলোই আনিসের খুব পছন্দের খাবার – পোলাও, কোরমা, ভুনা গরুর মাংস, মুরগির মাংস, মাছ ভাজা।

আনিস টেবিলে বসে আছে। তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে। রমিজ সাহেব নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করছেন। এখন এই ডাইনিং রুমে আনিস আর রমিজ সাহেব ছাড়া আর কেউ নেই। রমিজ বললেন, “আনিস,

তুমি আজকে আমার বাসায় থাকবে।”

“জি আচ্ছা।”

“আরেকটা কথা, আমার মেয়ে এবার কলেজে পড়ে। ওর জন্য একটা ভালো গৃহশিক্ষক খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে। তুমি তো খুব ভালো পড়াও। আমার মেয়েটাকে আজকে তুমি পড়াবে। পারবে না?”

“পারবো।”

এলাকায় নতুন এক ছেলে এসেছে — এ খবর ইতিমধ্যে গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব (সিরাজ চৌধুরী) এই খবর পেয়ে আনিসকে লোক মারফত তলব করেন। কিছুক্ষণ আগে চেয়ারম্যানের লোকেরা রাতে এসে রমিজ খানের বাড়ি থেকে আনিসকে তুলে নিয়ে গেছে।

রমিজ খান তাঁর লোকজন নিয়ে চেয়ারম্যানের বাসায় গেলেন। চেয়ারম্যান সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, “আরে হেডমাস্টার সাহেব, আপনি এখানে কেন?”

রমিজ সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, “আপনি আনিসকে তুলে এনেছেন কেন?”

সিরাজ চৌধুরী বললেন, “আমার বড় মেয়েকে পড়ানোর জন্য। আমার মেয়ের যদি তার পড়ানো ভালো লাগে, তাহলে তার সাথে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিবো।”

“এটা কি সিনেমা হচ্ছে নাকি? ছেলেটার সাথে আমার আগে পরিচয় হয়েছে, তাই তার সাথে আমি আমার মেয়ের

বিয়ে দেব।”

“হেডমাস্টার সাহেব, আপনি যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করেছেন। আপনি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বিদেয় হোন।”

“আমি বিদায় হবো মানে? ঐ ছেলেকে না নিয়ে আমি কোত্থাও যাবো না...” কঠিন তর্কাতর্কি চলছে। একসময় ব্যাপারটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য গ্রাম্য সালিশ ডাকা হয়েছে। সালিশ শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। রমিজ খান আর সিরাজ চৌধুরী মুখোমুখি বসে আছেন। দু’জনেই দু’জনের দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন।

সালিশে সিদ্ধান্ত হলো, হেডমাস্টার সাহেবের মেয়ের সাথেই আনিসের বিয়ে হবে। বিয়ে হবে আগামী সপ্তাহে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। শুভস্য শীঘ্রম্।

গ্রামের এক মুরব্বি বললেন, “হেডমাস্টার সাহেব, আপনি এই ছেলেকে আজকে আপনার বাসায় নিয়ে যান। আগামী সপ্তাহের শুক্রবার বিয়ে দেয়া হবে। শুক্রবার অতি শুভদিন। এই দিনে বিয়ে হলে আল্লাহপাকের অশেষ রহমত থাকবে।”

সালিশের এই সিদ্ধান্তের পেছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ না বলে ‘ব্যাখ্যাও’ বলা যেতে পারে। কারণগুলো নিম্নরূপ:-

১. রমিজ খান এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ও সম্মানিত

একজন ব্যক্তি।

২. তিনি এই গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। কাজেই তাঁর সামাজিক মর্যাদা চেয়ারম্যান সাহেবের থেকে ওপরে।

৩. চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে (মাঈমুনা ইসলাম তিমু) শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ। শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ বলার কারণ হল — তার একটি পা অন্য পায়ের তুলনায় একটু ছোট। যার কারণে সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না। (ব্যাপারটি চেয়ারম্যান সাহেব গোপন রেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।)

...ক্রমশ ■

https://www.facebook.com/groups/1833647555381153

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ মেঘের আড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর

গোবিন্দ মোদক

টাপুর টুপুর ছন্দ দুপুর
বৃষ্টি টিনের চালে,
গড়-গড়িয়ে নামছে যে জল
পুকুর পাড়ের ঢালে।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর
আষাঢ় শ্রাবণ জুড়ে,
কালো মেঘেই গাইছে আকাশ
মেঘমল্লার সুরে।

টাপুর টুপুর একলা দুপুর
ভিজছে অঝোরধারে,
ব্যাঙ মহাশয় নামতা পড়ে
জোড়া-বিলের পাড়ে।

টাপুর টুপুর ভেজা দুপুর
বন্দি খুকু ঘরে,

হর্ষ

কতো যত্ন করে কাগজ দিয়ে

নৌকো কতো গড়ে!

টাপুর টুপুর বৃষ্টি দুপুর

অঝোর ধারাপাত,

দিন ফুরালো সন্ধ্যা গেল

এলো গভীর রাত।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর

তবু বেজেই চলে,

ভেজা আকাশ ভেজা বাতাস

শাওন কথা বলে।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নূপুর

নাচটা এবার থামা,

আকাশ থেকে সরুক কালো

উঠুক সূর্য্যমামা।। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
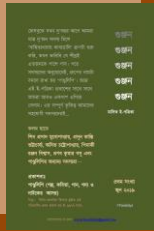
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিনাশ

(অন্তিম পর্ব)

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

পরের দিন সকাল বেলা স্নান-টান সেরে, ভারী ব্রেকফাস্ট করে, ঠিক দশটার সময় ওরা দুজন রেডি হয়ে গেল। ঠিক ১০-১৫ মিনিটের সময় মান্যয়ী সেনগুপ্ত একটা সাদা গাড়ি করে হোটেলের লনে এসে নামল। অনির্বানের কেমন যেন মনে হল ঐ সাদা রঙের গাড়িটা সরকারি গাড়ি। গাড়িটা পার্কিং জোনে গিয়ে দাঁড়ালো। রিসেপশনে বলা ছিল। তাই খানিকক্ষণের মধ্যে দরজায় বেল বাজলো। অনির্বানের বস দিপেশদা দরজাটা খুলতেই এক ঝাঁক সুগন্ধ নিয়ে মান্যয়ী সেনগুপ্ত হাত জোড় করে নমস্কার করে বলল, "আমি মান্যয়ী সেনগুপ্ত।" দিপেশদা প্রতি নমস্কার জানিয়ে "আসুন, আসুন" বলে ঘরে বসালেন। একটু তির্যক চোখে মান্যয়ী সেনগুপ্ত অনির্বানের দিকে তাকিয়ে ঘরের চারিদিকটা চোখ বুলিয়ে নিল।

দিপেশদা বললেন, "ম্যাডাম, চা কফি কিছু বলি।"

"হ্যাঁ আগে জল, তারপর কফি খাবো।" বস বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে মিনারেল ওয়াটার ও কফির অর্ডার দিল। তুরন্ত জল, কফি ও স্ন্যাক্স এসে গেল। দিপেশদা বেয়ারাকে বললেন, "আমরা না ডাকা পর্যন্ত কেউ যেন ঘরে না আসে।"

বাস্তবিক

জল খেয়ে মান্যয়ী সেনগুপ্ত কফির মগটা টেনে নিয়ে আর স্ন্যাক্সে কামড় বসাল। দিপেশদা কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "প্রজেক্টটা সুস্থভাবে কমপ্লিট করার জন্য আপনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন, বা আপনার কি বক্তব্য খোলসা করে জানলে আলোচনা করা যাবে।"

মান্যয়ী সেনগুপ্‌ত বলল, "প্রথমেই আমার একটা শর্ত আছে।"

"আপনার কি শর্ত বলুন।"

"প্রথমেই আমাকে অ্যাসিওর করতে হবে যে এই ঘরে কোন লুক্কায়িত সি-সি- ক্যামেরা আছে কিনা? আর আমরা তিনজনই আমাদের মোবাইলের সুইচ অফ করে এই টেবিলের উপর রাখবো, তারপর কথা হবে।"

অনির্বান মনে মনে ভাবলো এই মহিলা চতুর ও খুব বুদ্ধিমতী, নাহলে এইরকম একটা শর্ত আমরা জাস্ট ভাবতেই পারি না।

দিপেশদা বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "ম্যানেজার কো বুলাও" খানিকক্ষনের মধ্যে ম্যানেজার এসে পৌঁছতেই দিপেশদা বললেন, "আচ্ছা এই ঘরের মধ্যে কোন লুকানো সি-সি- ক্যামেরা নেই তো?"

ম্যানেজার বিনীতভাবে বললেন, "আমরা কাস্টমারের ঘরে কোন ক্যামেরা রাখি না, কারোর প্রাইভেসিতে আমরা আইনত হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কিন্তু স্যার করিডোর, সিঁড়ি, লন, পার্কিং জোন, সিকিউরিটি রুম, সব জায়গাতে সি-সি- ক্যামেরা আছে, কিন্তু কোনো রুমে নেই, আপনারা ১০০% নিশ্চিন্তে

থাকতে পারেন।”

“ঠিক আছে, আপনি যান।”

“স্যার আপনাদের লাঞ্চের মেনুটা যদি বলে দেন তো ভালো হয়। অর্ডার নিয়ে ম্যানেজার বললেন, লাঞ্চের আধ ঘন্টা আগে বলবেন স্যার, আমরা সময়মতো রুমে খাবার সার্ভ করে দেব।”

“O.K. Sure.” ম্যানেজার চলে যাবার পর যে যার মোবাইল সুইচ অফ করে টেবিলের উপর রাখা হল।

দিপেশদা বলতে শুরু করলেন, “ম্যাডাম এই প্রজেক্টটা সুস্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। প্রশাসন থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে যে আপনার সঙ্গে বসে আমরা যেন একটা রফাসূত্র বার করে নিই, বলুন এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে।”

মান্যয়ী সেনগুপ্ত বললেন, “আমি ইতিমধ্যে প্রশাসনের সঙ্গে দু-দুবার কথা বলে এসেছি। এও বলেছি এই প্রজেক্ট বন্ধ না হলে আমি অনশন আরম্ভ করব।”

“তাতে প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন যে, রেল ব্রিজটা করতেই হবে, তাই সবদিকটা বাঁচিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু একটা রফায় আসতে পারি কিনা।

আমি সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে ভালোবাসি ২৫ কোটি।” ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। অনির্বান বোবা হয়ে গেল।

দিপেশদা খুব ঠান্ডা মাথায় বললেন, “ম্যাডাম এই প্রোজেক্টটাতে

আমাদের ২৫ কোটি টাকা লাভই হবে না। লোকসান করে তো প্রজেক্ট করতে পারি না। দরকার হলে আমরা প্রজেক্ট থেকে হাত গুটিয়ে নেব। জাস্ট প্রজেক্টটা করবো না। এই কথা বলার পর মান্যয়ী সেনগুপ্ত হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে বলল, "না, না, প্রজেক্ট বন্ধ করার কোন দরকার নেই। দেখুন এই টাকাটা আমাকে সব জায়গায় বাটোয়ারা করে দিতে হবে। যারা আন্দোলন করার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে, এই অঞ্চলের যারা লিডার, যে সমস্ত গ্রামবাসী এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, ভাংচুর করার জন্য যে গুন্ডাবাহিনী, পুলিশ প্রশাসন – এমন কি আপনার প্রশাসন যারা আপনাদের আমার সঙ্গে বসে মিটমাট করতে বলছে, সেই প্রশাসনের সর্বস্তরে আমাকে টাকাটা দিতে হবে। আমি নিজে ক'টা টাকা পাবো! অনির্বানের গোটা শরীর রাগে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, মান্যয়ী সেনগুপ্তর গালে ঠাস করে কয়েকটা চড় মারে। কিন্তু দিপেশদার চোখের ইঙ্গিতে চুপ থাকতে হল।

দিপেশদা বললেন, আমিও সোজা কথা সোজাভাবে বলতে পছন্দ করি। আমি ১০ কোটির বেশি এক পয়সাও দেব না। তাতে রাজি থাকলে বলুন, নাহলে আমি প্রজেক্টটা ছেড়ে দেব। কারণ আমার মনে হচ্ছে, আপনি সব জায়গায় কথা বলে টাকার অঙ্কটা ঠিক করেছেন।

"হুঁ," বলে মান্যয়ী সেনগুপ্ত বলল, "কিছুটা বাড়ান, নাহলে আমার কিছু থাকবে না।" অনির্বান আর নিজেকে ঠিক রাখতে

পারলো না। চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আপনার লজ্জা করে না নকল বুদ্ধিজীবি সেজে ভাড়া খাটছেন, আর অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করছেন। এই আপনাদের মত লোকেদের জন্য আজকে দেশের এই অবস্থা।"

মান্যয়ী সেনগুপ্ত ততধিক উত্তেজিত হয়ে দিপেশদাকে বললেন, "আপনার লোককে চুপ করতে বলুন, আর একটা কথা বললে আমি এই শহর থেকে ওনাকে আর ফেরত পাঠাবো না।"

"কি এতবড় কথা," অনির্বান প্রত্যুত্তরে বলে উঠল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনির্বানকে চুপ করে বসে থাকতে বলল।

"হ্যাঁ মিস সেনগুপ্ত, আমি তো বলেছি ১০ কোটির বেশী দিতে পারবো না। এটাই আমাদের কাছে ভারী পড়ে যাবে।"

এবার মান্যয়ী সেনগুপ্ত বললো, "স্যার অন্ততঃ ৫০ লক্ষ বাড়ান।"

দিপেশদা হেসে বললেন, "ঐ ৫০ লক্ষটাই আপনার রোজগার বলুন।"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সবকিছু দিয়েথুয়ে আমি ঐটুকুই পাবো।"

দিপেশদা বললেন, "ঠিক আছে ঐ ১০ কোটি ৫০ লক্ষই পাবেন। টাকাটা কিভাবে, কখন, কোথায় নেবেন।"

মান্যয়ী সেনগুপ্ত এবার দন্ত বিকশিত করে বলল, "টাকাটা কিন্তু আমি ক্যাশেই নেব। টাকাটা আমি দশ বারে নেব। প্রত্যেকবার ১ কোটি করে আর শেষবারে ১ কোটি ৫০ লক্ষ।"

দিপেশদা একটু বিরক্তিভাব দেখিয়ে বললেন, “এই অঙ্কটা আমাকে না বললেও হতো যে শেষবারে ১ কোটি ৫০ লক্ষ দিতে হবে সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। ঠিক আছে, তাই দেব।”

মান্যয়ী সেনগুপ্‌ত এবার ব্যাগ থেকে একটা পেন বার করে খচ খচ করে নিজের নাম-ঠিকানা, মোবাইল নম্বর লিখে দিয়ে বলল ১০ দিনেই টাকাটা দিয়ে দিতে হবে, আর কোথায় কখন দিতে হবে তা ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেব।

দিপেশদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “দেখুন আমি কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বাড়ি বা ফ্ল্যাটে টাকাটা পৌঁছে দেব। কোন পার্কে, কোন ভাঙা বাড়ির পাঁচিলের ধারে গিয়ে টাকা দিতে পারবো না। এটা কোন মুক্তিপণ আদায় নয় যে গোপন জায়গায় গিয়ে টাকাটা দিতে হবে। সেটা যদি বলেন তাহলে আমি টাকা দেব না, আর প্রজেক্ট বন্ধ করে দেব।” মান্যয়ী সেনগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন “না, না, ঐ'টা আমার কলকাতার ফ্ল্যাটের ঠিকানা, ঐ এড্রেসে আপনি টাকা দিয়ে যাবেন শুধু আসার আগে একটা ফোন করে নেবেন।”

“দিপেশদা বললেন, আজকে এক্ষুনি কিছু অ্যাডভান্স দেব?”

“না, এখানে কোনো টাকা আমি নেবো না। সব টাকা কলকাতাতেই নেব। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, যে কেউ টাকা দিতে যাক না কেন টাকা হস্তান্তরের সময় কোন ছবি ও ভিডিও করা যাবে না। তার মোবাইল সুইচ অফ করে আমার কাছে জমা রাখতে হবে, টাকা দেওয়ার পর তাকে মোবাইল ফেরৎ দেব। কোনরকম চালাকির চেষ্টা করবেন না। তাতে

হিতে বিপরীত হতে পারে।” লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। যথারীতি চব্য-চোষ্য গিলে, লেমন শরবত খেয়ে মান্যয়ী সেনগুপ্ত বিদায় নেবার সময় নমস্কার জানাতেই অনির্বান আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না। “যান, বুদ্ধিজীবীর নাটক করে আবার কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা যায় আজ থেকে সেই চেষ্টা শুরু করুন গিয়ে, একটা তো ডিল হয়ে গেল। আজকে আপনাদের মত...”

“আঃ অনির্বান তুমি চুপ করবে। মান্যয়ী সেনগুপ্ত হাসতে হাসতে বেড়িয়ে গেল। ক্ষুব্ধ অনির্বাণকে বস বললেন, “দেখো অনির্বান চিৎকার চেঁচামেচি করে গলা ফাটিয়ে কিছু লাভ হবে না। আসলে আমাদের সমাজের শিকড়ে বিষ ঢুকে গেছে । মারতে হলে ঐ শেকড় শুদ্ধু মারতে হবে। তোমাকে আগে বলেছিলাম না এই কেসটার মধ্যে কিছু না কিছু lacuna আছে। আর সেটা কি জানো? প্রশাসন এই কেসটার মধ্যে আগাগোড়া জড়িত ছিল, আর তার জন্য ওরা মান্যয়ী সেনগুপ্তকে ব্যবহার করেছে। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী বলে কিছু নেই। এরা সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বাস করে। এই যে দেখো না মোমবাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মিছিল, প্রতিবাদে এরা মুখর, কোথাও শহীদবেদি লাথি মেরে ভেঙ্গে দিচ্ছে, কোথাও প্রশাসনের নির্দেশে কারখানা করতে দিচ্ছে না, ক্ষমতা ফিরে পাবার লোভে এরা নিজেদের সৃষ্ট গুন্ডাবাহিনী দিয়ে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাচ্ছে সাধারণ গরীব মানুষের উপর, হত্যার রাজনীতি

করছে, আবার বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে প্রতিবাদ, ধিক্কার জানাচ্ছে। আসলে আমাদের সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে কিছু নেই। সবাই বিক্রি হয়ে গেছে। এরা সময় ও সুযোগমতো নিজেদের ভাড়া খাটায় আর নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। দেখছো না এরা সরকারের কাছ থেকে কিরকম সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। সরকারী বিভিন্ন সংস্থায় এরা কর্ণধার হয়ে মোটা টাকা বেতন পায়, অথচ সমাজের জন্য এদের কোন অবদান নেই। এরা সকলে হাটে বিক্রি করা পচা মাল। এদের বিবেক বলে কিছু নেই, এরা বুদ্ধিজীবী আদৌ নয়, বৃদ্ধিজীবী। এই তো সেদিন এক বুদ্ধিজীবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার মত বুদ্ধিজীবীও শেষকালে কিনা? উত্তরে সে বলেছিলো, কি করবো বলুন, বয়স হয়েছে, টাকাটা আমার খুব দরকার। এই হচ্ছে আমাদের বুদ্ধিজীবী।”

“কিন্তু স্যার, আপনি তাহলে কম্প্রোমাইস করলেন কেন?”

“দ্যাখো অনির্বান, আমি যদি কোম্পানি চালাতে চাই তাহলে আমাকে টাকা দিতেই হবে, আর না দিলে আমি কোন কাজ পাবো না আর আস্তে আস্তে কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। কোম্পানি বন্ধ করে দিলে আমার কোন অসুবিধা হবে না, তোমার মত bright Engineer-ও কাজ পেয়ে যাবে। কিন্তু হাজার হাজার skilled & unskilled লোকেরা চাকরি হারাবে। বিশ্বাস করো, শুধু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এখনও কম্প্রোমাইস করে যাচ্ছি। যেদিন সত্যি পারবো না, সেদিন বাধ্য হয়ে কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। একটু

রেস্ট নিয়ে নাও। আজকের সন্ধ্যার ফ্লাইটে আমাদের ফিরতে হবে।” অনির্বান spellbound হয়ে মহান মানুষটার কথা ভেবে গর্বিত বোধ করল।

(এই গল্পতে বাস্তবতার ভীষণ ছোঁয়া আছে, এমন কি কিউল নদীর উপর রেলব্রিজ ও ইন্টারলকিং প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের নিন্দা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে করা হয়নি, সমষ্টিগতভাবে করা হয়েছে। এর জন্য কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত।)

গুঞ্জনের ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

জুলাইঃ রহস্য-রোমাঞ্চ ও কল্পকাহিনী সংখ্যা

অগাস্টঃ মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

সেপ্টেম্বরঃ পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

অক্টোবরঃ পূজা সংখ্যা

নভেম্বরঃ দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বরঃ অণু সংখ্যা

*অনিবার্য কারণ বশত, এই সূচী পরিবর্তিত হতে পারে।

গুঞ্জনের প্রকাশিত সংখ্যা ২০২২

জানুয়ারি ২০২২:
https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo/

ফেব্রুয়ারী ২০২২:
https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb/

মার্চ ২০২২:
https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath/

এপ্রিল ২০২২:
https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb/

মে ২০২২:
https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps/

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

হে প্রিয় বরষা

কাজী আনারকলি (বাংলাদেশ)

গ্রীষ্মের অনলে পুড়ে মাঠঘাট বৃক্ষ
সব নিদারুণ বর্ণহীন,
তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর মাটি ফেটে চৌচির
চুকিয়ে দিয়েছে সব ঋণ।

ইটভাটার বর্ণিল তপ্ত ইট যেন মন
বিক্ষুব্ধ ঝড়ে অন্তর ঠাসা !
হৃদয় অপেক্ষার প্রহর গুনে যায়
তোমার জন্য প্রিয় বরষা।

আজও পৃথিবীর বুকে শ্যাওলা জমেনি
প্রভঞ্জনে সজীবতা নেই,
খরার শকুনি ঠোঁট ঠুকরে ঠুকরে খায়
অভ্র মরে সেই লজ্জাতেই।

মেঘের ঘোমটা খুলে লজ্জা ভেঙ্গে তুমি
হে প্রিয় বরষা, এসো ধীরে,
মাটির সাথেই হবে তোমার প্রনয় লীলা
জমবে খেলা আলোক ঘিরে।

স্নাতক পৃথিবী হয়ে উঠবে তখন বর্ণময়
সঞ্চার হবে নব প্রাণের,
সূর্যের আঁচলে তনু ঢাকা পড়ে যাবে -
মা হবে ফুল ও ফসলের। ■

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ কামাখ্যা মন্দিরে সাধুর সিঙ্গা বাজানো...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

যুদ্ধ

(অন্তিম পর্ব)

প্রসাদ চৌধুরী

রামদেও ঘরে পা দেওয়া মাত্র তার বউ তটস্থ হয়ে পড়ে। বাচ্চা তিনটিও চেঁচামেচি থামিয়ে নির্জীব পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু তিনটি বাচ্চাই তার নয়। আরো আছে একজন। ঘর ছাড়িয়ে সে বাইরেটাও সবে চিনতে শুরু করেছে। বাপ বড় একটা তার নাগাল পায় না।

আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে বউ জড়সড় হয়ে বসেছিল। রামদেও না ফেরা পর্যন্ত ওমনিভাবেই বসে থাকতে হয়। কি শীত, কি গ্রীষ্ম — জীবনের এক স্বপ্নাতীতকালে সে স্বামী ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকত। কেবল কেবল রীতিটা সেই থেকে আজও অবধি অব্যাহত আছে।

‘ওগো আমার ঘুম পায়।’

‘চলবে না’

‘ওগো, আমার শরীরে যে আর দেয় না।’

‘না, না, চলবে না, তোমাকে ঠায় বসে থাকতে হবে।’

পান্নার ঘুম পায়। অসুখে বিসুখে সে আজ কাল বড় কাহিল হয়ে পড়ছে। তার উপর এই সারাদিনের খাটা

খাটনী। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে রামদেও আর আস্ত রাখবে না, তাই সে কেবল পড়ে পড়ে ঝিমোয়। দরজায় শব্দ পড়তেই পান্না ধরফড়িয়ে ওঠে।

'মাগিটা তাহলে ঘুমোচ্ছিল।' ঘরে ঢুকেই রামদেও বুঝতে পারে। ওমনি মেজাজটা তার তিরিক্ষি হয়ে গেল। ঝড় জলে ভিজে যাওয়া মাথায় চুলে হাত বুলিয়েই প্রশ্ন করে, 'ঘুমোচ্ছিলি?'

একটা শব্দ করে পান্না, যেন গলা আটকে আসে। অজ্ঞাতসারেই সে মাথার ঘোমটা আরও লম্বা করে দিয়ে কাপড় চাপা দেয় মুখে। 'খানকি মাগী' দাঁতে দাঁত পিষে রামদেও নাকের থেকে কাপড়টা হিচকে টান মেরে ফেলে সে কুদিয়ে ওঠে, 'কাপড় ফেল।' এলোপাথাড়ি একচোট পিটিয়ে সে ফুঁসতে থাকে, 'বল দিবি আর কোন দিন? উ-দিবি।'

বউ পান্না পিছন ফিরে ঘাড়টা গুঁজে কোন রকমে দু'পায়ের উপর খাড়া হয়ে থাকল। কোনো প্রতিবাদ নেই। কান্না নেই।

বাপের হঠাৎ ফেটে পড়া — অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। বাচ্চাগুলির কারো মুখে আর ট্যাঁ-ফোটি নেই। রীতিমতো একটা যুদ্ধ শেষ করে এইমাত্র রামদেও ভাত খেয়ে ঠাণ্ডা হল। পান্না বাঁশের মাচায় শয্যা নিল। এলোপাথাড়ি মারের আঘাতেই শুধু নয়। আজ শরীরটা সারাদিনই খারাপ গেছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নিরুপায় হয়েই স্বামীর সামনে শুয়ে পড়ল।

রামদেও নিজেই হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে এখন আবার অজানিত শঙ্কায় ব্যাঙের মত খোঁড়লে ঢুকে পড়ল যেন। কিছু কেলেঙ্গারী না ঘটালেই হয়।

হঠাৎ রাত্রের প্রোগ্রামটার কথা মনে পড়তেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ, এতোয়া, বিরশা, সোংড়া ইত্যাদি শ্রমিক দলকে এক জায়গায় ডেকে এনে সাতটায় হাইরোডের লাইন হোটেলে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যাবার সময় বউকে লক্ষ্য করে সে বলে গেল, 'আমার ফিরতে রাত হবে। না ফিরলে থানায় যাসনে যেন। সাবধানে থাকিস। ওই শুয়োরটা কোথায়? হুম্ বেটা চড়তে বেরিয়েছে না? এদিকে গেলাটা ঠিক আছে। বেটা জাহান্নামে যাচ্ছে! পিটিয়ে লাশ করে ছাড়ব!'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বর্তমানে সে আরেকটি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'ল। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে গেল। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি এল শহর থেকে, টাটা ট্রাক এবং যথারীতি রামদেও লেবার সংগ্রহ করে গাড়ি চড়ে সোজা রায়ডাক ফরেস্টে গিয়ে নামল। নেমে গাড়ি লেবার রেখে সে এগিয়ে গেল আরও দক্ষিণে।

সামনেই রামবাহাদুরের ঘর। ঘরটা এক নজরেই চেনা যায় কাঠের ঘর। নানা রঙের বাহার। দরজাগুলি মিস্ত্রী দিয়ে তৈরী করিয়ে এনেছে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে। পাকা শিশু কাঠের পাল্লা। গোয়াল ঘরেও অনেকগুলি তাজা মোষ গরু।

বসতির মধ্যে সে বেশ অবস্থাপন্ন। জমি জমাও করেছে।

এখানকার পাহাড়ী জঙ্গলের আদিবাসীদের অভাবের সুযোগ নিয়ে, সামান্য টাকা পয়সা — না হয় দু-চার কুনকো ধান মকাই-এর বিনিময়ে রামবাহাদুর বেশ বিকিকিনির হাট বসিয়েছে। লোকগুলো দেখছে রামবাহাদুরের এলেম। রামবাহাদুর মাঝে মাঝেই শহরে যায়। দু'একবার চোরাকাটাই-এর ব্যাপারে এরাও ধরা পড়ে। কোর্টে গিয়ে রামবাহাদুরই তাদের ছাড়িয়ে আনে। রামদেও কোনদিন ধরা পড়েনি; কিন্তু অন্যান্য লেবার দু'একবার ধরা পড়লেও এই রামবাহাদুর ছাড়িয়ে এনেছে।

রামবাহাদুর জানে, কী করে বিট অফিসারদের হাত করতে হয়। কী করে রেঞ্জ অফিসারের হাতে ঘুষের টাকা দিয়ে কাঠ পাচার করা যায়। ঘুঘুলোক। বস্তির বসতের অনেকেই তাই মানে রামবাহাদুরকে। তারা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, রামবাহাদুর তাদের চেয়ে অনেক এলেমদার। পাহাড়ী বনের বিভিন্ন বসতির অনেকেই তাই সমীহ করে তাকে। অবশ্য সেই তাদের কথাটা জানিয়েছে — এ বনে তাদেরও দখল আছে। অভাব পড়লেই তারা বনে চলে যায়।

শহরের ছোট বড় কাঠের ব্যবসায়ীরাও ওকে খাতির করে। খাতির করে করাত কলের মালিকও। শিশু আর গামার কাঠ কিছু চোরাই পথে পৌঁছে দিলেই খুশী ওরা। দামী কাঠ।

নিলামের প্রতিযোগিতায় মাল রাখার ঝুঁকি অনেক। তার চেয়ে বাজার দরের অর্ধেক দরে কাঠ পেলে মুনাফার অঙ্কের কথা ভেবে হলেও রামবাহাদুরের মতো ধূর্ত লোককে খুঁজবেন মার্চেন্টরা। অনেক দামী গাছের সন্ধান ওরা রাখে। রাতের অন্ধকারে ট্রাকে করে দামী কাঠ উধাও করতে ওদের সময় লাগে না। টাকা ছড়িয়ে বিটবাবু চেকপোষ্টকে হাতের মুঠোয় আনতে না পারলেও টাঙ্গী, তীর ধনু অথবা কুকরির ভয়ে বনবিভাগের শ্রমিকরা রামবাহাদুরদের হাতের মুঠোয় আসে বৈকি। মুশকিল হচ্ছে গাড়িতে মাল লোড করে রাস্তায় ওঠার পর। কাগজ পত্র না থাকলেই থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াবে। মালসহ গাড়িকে খালাশ করতেই দু'চার ট্রিপ মালের দাম আক্কেল সেলামী দিয়ে তবে মুক্তি। তবু রামবাহাদুর থমকে দাঁড়ানোর ছেলে নয়।

রামদেও-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ ফিস্-ফাস্ কথা বলে ওরা গাড়িটা নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ী ঝর্নার সামনে থামল। এবং রামদেওদের দলটা টর্চ হাতে নিয়ে জানোয়ারের মতো ধীর পায়ে এগিয়ে মালের সন্ধান পেয়ে জমা করা খয়ের কাঠ কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়িতে উঠিয়ে নিল দ্রুত-কলম দিয়ে ঠেলে ঠেলে। 'জুগারী' জোগাড় ছিল রামবাহাদুরের।

মাল নিয়ে ট্রাকে করে ফিরে এল ভোর চারটায়। 'হাইরোডে' রামদেওদের নামিয়ে গাড়ি চলে গেল শিলিগুড়ির

পথে। ক্যাশ একশো টাকার মালিক এখন রামদেও। ভাগে সে আরও দশ টাকা বেশি পাবে। ওটা বাড়তি দিয়েছে মালের বর্তমান মালিক। ওই টাকা আর ঘরে পৌঁছবে না। সবাই মিলে চোলাই খাবে।

গরম বস্তিটা একেবারে নিশি নিঃঝুম। একটা প্রাণীও বোধহয় জেগে নেই। ডুবে আছে অন্ধকার। কেবল শোনা যাচ্ছে খানা-খন্দের ব্যাঙেদের উল্লসিত চিৎকার আর পাশের জঙ্গলে ঝি-ঝি পোকার ঐকতান।

ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। মদের নেশাটা এখনও কাটেনি। তাই তর সইলনা রামদেও-এর। ধরাম করে এক লাথি মারতে দরজাটা হাট করে খুলে গেল। মুখ দিয়ে ছিটকে ছাটকে খিস্তি ছুটছে। হা-হা করে বাতাস ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে। ঘরের এককোণে হেরিকেনের শিখাটা কাঁপতে শুরু করেছে। বড় ছেলেটা বোধহয় ত্রস্ত হয়ে শুধু কঁকিয়ে উঠল, মা - উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়ে নিচে চোখ নামিয়ে নিল।

সামনে হলদে কাপড়ে ঢাকা পান্না আড় হয়েই শুয়ে আছে। অ্যা, হুম্ মাগী ঘুমোচ্ছে না? রামদেও গর্জে উঠেই একটা টান মারল বউকে। কই তটস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল না তো!

রামদেও বিস্ফারিত চোখে একবার ঝুঁকে পড়ে বউয়ের নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখল - ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে হাঁ হয়ে রয়েছে মুখখানা।

'অ্যা!' আঁতকে উঠে রামদেও। এইমাত্র যেন তার নেশাটা টুটে গেল। দুই অক্ষিগোলকের মধ্যে দিয়ে স্থির তাকিয়ে সে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'মরে গেছে!' দরজার দিক আড়াল করে দাঁড়িয়ে সে আওরাতে লাগল 'আমি কি শালার জানতাম, আজই.........হি-হি-হি, মাগী, আমাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া' ক্ষোভে-দুঃখে কিম্বা শীতেই বুঝি তার দাঁতগুলি কিড়মিড় করে শব্দ করে উঠছে। বউকে ফেলে রামদেও দরজার দিকে ধেয়ে গেল। ডুকরে উঠে বলল, 'মাগীটাকে বাঁচাতে পারলাম না আমি বাঁচাতে পারলাম না।'

দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে ভিড় জমে উঠল আশে পাশের বস্তির বাসিন্দাদের। সময় গড়িয়ে চলল। অনেকক্ষণ হ'ল সকাল হয়েছে। সারা রাত্রি ও দিনের অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত রামদেও তবুও বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদেই চলেছে থেমে থেমে। তার আঠারো ঘণ্টার খাটুনির বিনিময়েও বউ-এর শরীরে পুষ্টি জোগানোর খাদ্য সে দিতে পারেনি। রামদেও মাতাল নয়। দেহের ক্লান্তি মোচন করতেই সে মদ খায় আর বউকে বকে। তাই স্ত্রীর মৃত্যুতে তার চৈতন্যে এই মুহূর্তে একটা বিরাট রকম নাড়া দিয়ে গেল। সকালের বাতাস চিরে এক সময় থেমে থেমে একটানা সিটি পড়ল সাইরেনের। সাইডিং মুখো যাবার সময় হ'ল আবার। ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুলাই ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই জুন, ২০২২